আমার গুরু বাড়ির কিছু কথা

—অরণি মুখোপাধ্যায়

ওঁ

আজ প্রথমে আমি যাঁর কথা বলব তিনি বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী শ্রীমতী নিভাননী দেবী। সুদূর গোয়ালিয়রে তাঁর পিতৃগৃহ। পিতা বিদেশী গাড়ী এদেশে এনে ধনী ব্যবসায়ী প্রভৃতির কাছে বিক্রয় করতেন। স্বয়ং গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়াও তাঁর কাছ থেকে গাড়ী কিনতেন।

শোনা যায় একবার স্বয়ং মহারাণী তাঁকে ডেকে পাঠান। তিনি বিনয়ের সঙ্গে ম্যানেজারকে বলেছিলেন – মহারাজা এখন বিদেশে। তাঁর অনুপস্থিতিতে সন্ধ্যার পর আমার রাণীমার সঙ্গে সাক্ষাত করা উচিত হবে না। এই ধরনের মানুষের তিনি ছিলেন একমাত্র কন্যা। সুদূর গোয়ালিয়র থেকে এই নবপরিণিতা বধূ স্বামীর সঙ্গে বর্ধমান শহরে আসেন। স্বামীর নাম ছিল শ্রী দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়। তিনি শ্রীশ্রী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র। এই মহিয়সী দীর্ঘ জীবনে অনেক শোক পেয়েছেন অকালে স্বামী চলে গেছেন। জীবিত কালে জ্যেষ্ঠপুত্রও চলে গেছে। তথাপি শ্রীশ্রী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস দেবের কৃপাপ্রাপ্ত এই পুণ্যবতী গৃহবধূ তাঁর দীর্ঘজীবন সাধিকার মত পালন করেছেন। শ্রীশ্রী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস দেবে সমর্পিত প্রাণ এই আশ্রম বধূ তাঁর আদেশকেই শ্রীগুরু আদেশ জ্ঞানে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছেন। তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। মধ্যাহ্নের আহারের সময় কোনো ভিখারী বা ভিখারিণী সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আর্তকণ্ঠে যখন বলত – দুটি ভাত দাও মা। তখন তিনি আপন আহারের থালাটা সেই ভিখারি বা ভিখারিণীকে অম্লান বদনে দিয়ে দিতেন। ঘরে যা থাকত অর্থাৎ মুড়ি বাতাসা ইত্যাদি সহযোগে মধ্যাহ্নে আহার করতেন।

এবার একটা অন্য প্রসঙ্গে আসি। গুরু যখন শিষ্যকে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন তখন কোনো কোনো সময় অন্য কোনো মহাপুরুষ সূক্ষ্ম দেহে সেই দেহী শ্রীগুরুর মধ্য দিয়ে দীক্ষা দিতে পারেন। এটা একান্ত ভাবেই অনুভূতি সাপেক্ষ। এই দুর্লভ অনুভূতিকে অনুভবগম্য করা আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে একটি কথা যা আমি আমার এক গুরুভ্রাতার কাছে শুনেছি এবার তা বলি। সে আমায় বলেছিল যথানিয়মে আমায় আনুষ্ঠানিক দীক্ষা দানের পর শ্রীগুরুদেব তাঁকে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন ''চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমায় তোর দীক্ষা দানটা দেখতে হল''। এই বলে তাঁর দেহী শ্রীগুরুদেব থামলেন। আর একটি কথাও তিনি বলেননি। পরে অবশ্য আমার সেই গুরুভাই জানতে পেরেছিলেন কে তাঁকে অলক্ষ্যে থেকে দীক্ষা দান করেছেন। আরো বলি দীক্ষা অর্থাৎ শ্রী গুরুশক্তি নানা ভাবে দীক্ষার্থীকে সঞ্চার করা যায়। মন্ত্র বিচার করে দীক্ষা দেওয়া যায়, স্পর্শ দ্বারা কোনো শক্তিমান পুরুষ অন্যের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করতে

পারেন অথবা দৃষ্টি দ্বারা সেই ঐশী শক্তি সঞ্চারিত করা সম্ভব। যিনি সিদ্ধ পুরুষ তিনি কি ভাবে জিজ্ঞাসু দীক্ষার্থীকে শক্তিদান করবেন সেটা একান্তই তাঁর বিচার্য। তবে এটাও মনে রাখতে হবে গুরু কোনো মানুষ নয়। গুরু একটি শক্তি। তাকে কৃপা শক্তি বা অনুগ্রহ শক্তি বলা যায়। যে সিদ্ধ নরদেহের মধ্য দিয়ে সেই শক্তি দীক্ষার্থীকে দান করা হয় সেই সিদ্ধ নরদেহই তার গুরু।

আবার নিভাননী দেবীর কথায় আসি। নিভাননী দেবী মাঝে মাঝে নানা কথা বলতেন। তখন আমার বয়স বছর পঁচিশ/ছাব্বিশ। একদিন বললেন ''তখন আমি নোতুন বউ। মাঝরাতে একদিন ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম পাশে তোমার দাদু নেই। ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম এত রাতে সে গেল কোথায়? শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক তাকাতেই চোখে পড়ল নীচে গোপাল মন্দিরের আলোটা জ্বলছে। এছাড়া সারা বাড়ী অন্ধকার। সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলার উঠানটা পার হয়ে গোপাল মন্দিরের সামনে এসে দেখি তোমার দাদু গভীর ধ্যানে মগ্ন। চুপচাপ ফিরে এলাম''।

আমার গুরুদেব ছিলেন শ্রীদুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যমপুত্র। একদিন আমার গুরুদেবের মাতৃদেবী অর্থাৎ নিভাননী দেবী দোতলা থেকে নেমে দেখলেন গোপাল মন্দিরের সামনের সিঁড়িতে একটি ছেলেমানুষ ছেলে বসে আছে। ভারি লাবণ্য যুক্ত তার দেহকান্তি। সে বলতে লাগল তোমরা গোপালকে ভাল করে ভোগ দিচ্ছ না। তাকে একটু যত্ন করে ভোগ দাও। অবশ্য আমি যখন আছি তখন তোমাদের কোনো ভয় নেই। আমি মনে মনে ভাবলাম – এতটুকু ছেলে তার আবার এত কথা। এমন সময় তোমার দাদু ওপর থেকে নেমে এলেন। আমায় বললেন – তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে? এবার আমি পিছনে তাকিয়ে আর ছেলেটিকে দেখতে পেলাম না। ভাবলাম তাইতো ছেলেটা গেল কোথায়? এবার উনি বললেন এত সকালে একটি ছোটো ছেলে হঠাৎ কোথা থেকে এল? ইনি স্বয়ং গোপাল যেখানে উনি বসেছিলেন সিঁড়ির সেই জায়গাটা হাত দিয়ে ঘষে তুমি শুঁকে দেখ? আমি তাই করলাম। অপূর্ব সুগন্ধে জায়গাটা ভরে আছে। তারই খানিকটা আমার হাতের আঙুলগুলোকে সুগন্ধে ভরে দিয়েছে। পুরোহিতের বদলে তার পরদিন তিনি স্বয়ং গোপাল বিগ্রহকে স্নান করালেন এবং নানা উপাচারে ভোগ নিবেদন করে নিজে স্বয়ং পূজো করলেন। আরো বহুবছর পরে তাঁর বলা এই পুণ্য কথা তোমাদের জানালাম। কথা প্রসঙ্গে একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম – আচ্ছা আপনার দীক্ষা তো কুলগুরুদেবের কাছে হয়েছিল কিন্তু তাঁর দীক্ষা? তিনি সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে শুরু করলেন। এবার তাঁর কথাতেই বলি – একদিন দেখলাম বাপ-ব্যাটাতে দুজনে কি কথা হ'ল। তারপর সন্ধেবেলায় আমি যথারীতি সন্ধ্যা দিতে গেলাম। এরপর উনি আমায় বললেন – রাতে ছেলেগুলোকে একটু সামলে রেখ। হঠাৎ কোনো জোরে শব্দ না করে বা ঘর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে না যায়। এরপর রাত এগারটা নাগাদ কুয়োতলায় জল ঢালার শব্দ পেলাম। বুঝলাম উনি স্নান করছেন। তারপর পূজোর কাপড় ও চাদর নিয়ে গেলেন এরপর বাবার ঘরের দরজা খোলার শব্দ পেলাম। এতরাতে বাবা তো কখনও দরজা খোলেন না। যাহোক্ আমি চুপচাপ সব দেখে যাচ্ছি। এরপর দেখলাম একটা উজ্জ্বল জ্যোতি শূন্য দিয়ে এসে বাবার ঘরে ঢুকে গেল ব্যস। সকালে জানলাম বাবার (বিশুদ্ধানন্দদেবের) হিমালয়ের যোগাশ্রমের কোনো মহাত্মা তাঁকে কাল মহানিশায় দীক্ষা দান করেছেন।

আরো শুনলাম তিনি তাঁর শ্রীগুরুদেবকে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করেছেন তাঁর একটা কিছু ওনাকে দান করতে যা উনি প্রত্যহ পূজা করতে পারেন। তখন তাঁর শ্রীগুরুদেব তাঁর ব্যবহার করা চন্দন কাঠের খড়মজোড়া তাঁকে সস্নেহে দান করেছেন। আরও বলেছেন এই সিদ্ধমন্ত্রের যথাযথ জপের সঙ্গে আরো যে যোগক্রিয়া আছে তা যেন সে তাঁর বাবার (বিশুদ্ধানন্দদেব) কাছে জেনে নেয়। তারপর থেকে ধীরে ধীরে সংসারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ক্রমশই আলগা হতে লাগল। বললেন বহুদিন সংসার হল এবার তুমি ছেলেদের দেখ আমি আমার কাজে মন দিই। ছাদের ওপরে যে ছোটো ঘরটি ছিল তিনি রাত্রে সেখানেই ঘুমাতেন। নিজের পড়াশোনা চিঠি পত্র সে ঘরে বসে নির্জনেই লিখতেন। মাঝ রাতে আহ্নিক করতে চলে যেতেন। সকালে আহ্নিক শেষ হলে আমি তাঁকে জলখাবার – চা দিতাম। তারপর বাকি দিনটুকু তিনি একতলায় যে বড় ইজি চেয়ারটা দেখেছ সেখানে বসে খবরের কাগজ পড়তেন, রেডিয়োতে খবর শুনতেন। মানুষজন এলে বাইরের বৈঠকখানায় অতিথিদের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বলতেন। এই বলে উনি থামলেন। এ প্রসঙ্গে বলি বিশুদ্ধানন্দদেব তাঁর দিনলিপিতে লিখেছিলেন – ''অদ্য শ্রীমাধবানন্দ পরমহংসদেব আমার পুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হইলেন'' শোনা যায় বিশুদ্ধানন্দদেবের গুরুধামের মহর্ষিদের অনুরোধে তিনি তাঁর পুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হন। তিনি নাকি সেই অতি সিদ্ধিশালী যোগীদের বলেছিলেন – আপনাদের আদেশ আমার শিরোধার্য। তবে আমি প্রার্থনা করি পঞ্চাশ বছরের বেশী আমায় মর্ত্ত্যধামে যেন থাকতে না হয়। এখানে আমার আসন শূন্য থাকবে তাই আমার এই যোগভূমিতে ফিরে আসার প্রয়োজন। গুরুধামের মহর্ষিগণ তাঁর এই প্রার্থনা অনুমোদন করেন। মাত্র সাতচল্লিশ বছর কয়েকমাস বয়সে তিনি পুরুলিয়া জেলার ঝালদা আশ্রমে দেহাতীত হন। এ প্রসঙ্গে আমার শ্রীগুরুদেবের জ্যেষ্ঠ্য ভ্রাতা আমায় যা বলেছিলেন এবার আমি সেই কাহিনী আমার ভাই-বোনেদের জানাই।

সরোজ মোহনদেব শুরু করলেন – বাবার শরীরটা তখন ভাল নেই ঝালদায় দাদামশায়ের (বিশুদ্ধানন্দদেব) একটি আশ্রম আছে। ঝালদার রাজা তাঁর মন্ত্রশিষ্য উদ্ধব সিং এ আশ্রম গুরুকে দান করেন। সেখানে বাবু – মা – কাকাবাবু ও আমি গেছি। আমার পরের দুই ভাই তখন ছাত্র। তারা আমাদের বর্দ্ধমানের বাড়ীতেই আছে। ক্রমসঃই বাবার স্বাস্থ্যের অবনতি হতে লাগল। বাড়ীর সকলেই চিন্তিত। এমন সময় সেই ঘটনাটি ঘটল। যথারীতি মহানিশায় প্রতিদিনের মত তিনি মালাটি নিয়ে জপ শুরু করলেন। বেশ কিছুক্ষণবাদে তাঁর জপ শেষ হল। এবার উনি স্থির হয়ে বসে আশ্রমের অদূরে যে বড় ঝিলটি আছে আর তার অল্প দূরে পাহাড় সেদিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন – ''পূর্ণিমার আলোয় চারিদিক ভরে গেছে। অল্পক্ষণ বাদে আবার বললেন – গোপীরা এলেন, গোপীরা এলেন। এবার আবার বললেন শ্রীকৃষ্ণ এলেন শ্রীকৃষ্ণ এলেন একটুক্ষণ চুপ করে থেকে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন শ্রীরাধিকা এলেন, শ্রীরাধিকা এলেন এবার অতি মৃদু কণ্ঠে উচ্চারিত হল—মহারাস শুরু হল। মরজীবনে এই তাঁর শেষ উক্তি। এবার ব্রহ্মারন্ধ্র পথে শ্রীশ্রী বিশুদ্ধানন্দ তনয় শ্রীশ্রী দুর্গাদাসের মহা নিষ্ক্রমণ হল। যোগী দুর্গাদাস তাঁর হিমালয়স্থিত যোগধামে পুনরায় ফিরে গেলেন। এই বলে বক্তা যে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র, নীরব হলেন। একথা লিখতে গিয়ে আমার কবির একটি উক্তি মনে পড়ছে –

''হারায় যা, তা হারায় শুধু চোখে।
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার,
যায় চলে আলোকে।''

আমার মিশনের ভাই বোনেদের আর ধৈর্য্যের পরীক্ষা নেব না। এবার শুধু আমার শ্রীগুরুদেবের বলা একটি সত্য দর্শনের কাহিনী শোনাব। তখন পিতামহী দেবী অল্পদিন হল দেহাতীত হয়েছেন। শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করতে আমি একদিন তাঁর কাছে বর্দ্ধমানে গেছি। প্রয়াতা পিতামহী দেবীর কথা তাঁর কাছ থেকে শুনছি। আমি বললাম তিনি ছিলেন। এখন থাকলে পদস্পর্শ করে প্রণাম করতাম। এখন আর সে সুযোগ হবে না। তিনি এবার আমার দিকে তাকিয়ে স্মিত কণ্ঠে বললেন – তিনি কোথায় গেছেন? এই বলে আমায় বললেন মা চলে যাবার অল্পদিন বাদে আমার পা টা ভাঙল। ডাঃ সুনীল ঠাকুর তখন বর্ধমানে। তিনি এসে দেখলেন বললেন পাটা একটু বেকায়দায় ভেঙেছে। সার্জারি না করতে হয়? আমায় ক্রেপ ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে গেলেন। সমস্ত শরীরে একটা অসোয়াস্তি রয়েছে। সেই নিয়েই রাতে ঘুমোতে গেলাম। তখন গভীর রাত হঠাৎ দেখি ''মা'' সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সেই সরু পাড় ধুতি-শাড়ীর মত গায়ে জড়ান। আমায় স্নেহস্বরে বললেন – ''পাটা আবার ভাঙলি বাবা। দেখি কোন জায়গাটায় ভেঙেছে''। এই বলে তাঁর হাতটি আমার পায়ের সেই জায়গায় স্নিগ্ধ হাতে বুলিয়ে দিলেন। এরপর তাঁর অন্তর্ধান হল। পরদিন আবার ডাঃ ঠাকুর এলেন। উনি ভাঙা জায়গাটা দেখে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য হলেন। আমায় প্রশ্ন করলেন – এরমধ্যে আপনি কি আর কাউকে দেখিয়েছিলেন? কাল দেখে মনে হয়েছিল পায়ে হয়ত অপারেশন করতে হতে পারে। আজ তো দেখছি অনেকটা সামলে গেছে। ব্যান্ডেজ বেঁধে রাখলেই সেরে যাবে। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম অন্য কাউকে দেখিয়েছিলেন কি? আমি নিশ্চুপ। এর কিছুদিন বাদে আমি স্বাভাবিক ভাবে হাঁটা-চলা শুরু করলাম। আমি নির্বাক। তাঁর বলা একটি কথা মনে পড়ল – মাথার ওপর থেকে ছাদ সরে গেলে মানুষ আকাশের তলায় দাঁড়ায়। আকাশ কখনও সরে না। মা হলেন সেই আকাশ। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। করুণাময়ী মায়ের স্মরণ দিনে আমার ছোটো বোন আইভি ও যাঁকে আমি আলাপের সূত্রপাত থেকে দিদি বলে জানি ও মানি সেই নূপুরদির অনুরোধে লেখাটি দিলাম। আমার ভাই বোনেদের ভাল লাগলে আমি আমার এ প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করব। পরিশেষে বলি – ''রাসের গুরু শ্যামের গুরু। তোমার গুরু, আমার গুরু। সবার গুরু একই গুরু এই বোধেতেই সাধন শুরু''।

মা করুণাময়ী – বিজ্ঞানন্দ মহারাজ ও ঠাকুর শ্রী লেনিন রায়ের আশীর্বাদে এই মিশন মানবকল্যণে চিরকাল ব্রতী থাক। এই আমার একান্ত প্রার্থনা।